**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর**

পাঠ-১ঃ ১। (খ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ); ৬. (ক)।

পাঠ-২ঃ ১। (গ); ২। (ক); ৩। (ক); ৪। (খ); ৫। (গ)।

পাঠ-৩ : ১। (ক); ২। (খ); ৩। (ঘ); ৪। (গ); ৫। (ক)।

# ৯

## মুক্তিযুদ্ধ ও বহির্বিশ্ব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বিশেষ করে দুই পরাশক্তি- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রাইজিং পাওয়ার (Rising power) হিসেবে বিবেচিত ভারত ও চীনের ভূমিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। উল্লেখিত শক্তিসমূহের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিবেচনায় বিপক্ষ শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট ও সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ এবং চীনা জনগনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। যাহোক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই পরাশক্তি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান ছিল স্নায়ুযুদ্ধ। আদর্শিক দ্বন্দ্বে বিশ্বের বৃহৎ দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল এবং বিশ্ব রাজনীতিতে অন্যতম শক্তি হিসেবে (অনেকের মতে তৃতীয় শক্তি) আবির্ভূত হয়েছিল চীন। তাছাড়া ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর এ দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম অবনতি ঘটেছিল। তদুপরি চীন-ভারত সীমান্ত উত্তেজনাতো ছিলই। আর

উপমহাদেশসহ আর্ন্তজাতিক রাজনীতির এমনি এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। তাই বাইরের ছোটবড় বেশ কিছু দেশ এ যুদ্ধের সাথে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এসব দেশের নীতি ও কর্মকান্ড বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রবাহকে প্রত্যক্ষভাবেই প্রভাবিত করেছিল। ভৌগোলিক ও ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডটি বহির্বিশ্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ মেলে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া ও নীতিসমূহের দিকে আলোকপাত করলে। তবে একথা সত্য যে, কোন শক্তিই কেবল আদর্শগত কারণ বা মানবিক কারণে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন বা এর বিরোধিতা করেনি, বরং এর পিছনে ছিল প্রত্যেক শক্তিরই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা।

**এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ**


- পাঠ-১. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা
- পাঠ-২. মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা
- পাঠ-৩. মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা
- পাঠ-৪. মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা
- পাঠ-৫. মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ


## *পাঠ-১*

## *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত কেন সমর্থন করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা জানতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান কি ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল ভারত তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহির্বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হয় সে প্রতিক্রিয়ায় ভারতই প্রথম দেশ- যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত পজেটিভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারত এত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশ বা ভারতে এ বিষয় কোন প্রামান্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অনেকে

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন- যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিবরণ আছে, মুক্তিবাহিনীর সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ যুদ্ধের বর্ণনা আছে, পাকিস্তানি বাহিনী ও দেশীয় দালালদের কার্যকলাপের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা তেমন উল্লেখ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও ভারতের সামরিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, কোথাও রাজনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ভারতের সাহায্যের সামগ্রিক দিক কখনও আলোচিত হয়নি।

১৯৯৫ সালে সারা ইউরোপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে। মিত্রবাহিনীর যোদ্ধাদের সারা পৃথিবী থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তাদের সংবর্ধিত করা হয়েছে সাড়ম্বরে, টেলিভিশনে তাদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পঞ্চাশ বছর পরও মিত্রবাহিনীর বীরযোদ্ধা এবং নিহতদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বাহিনী কবলিত পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়েছিল।সরকারিভাবে সামরিক মহড়া, কুচকাওয়াজ, জেলখানা, হাসপাতাল ও এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের কর্মসূচিও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারি বা বেসরকারি কোনও উদ্যোগের ভেতর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান স্মরণ করার কোনও কর্মসূচি স্থান পায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যেসব সদস্য শহীদ হয়েছেন তাদের অবদানও সরকারিভাবে স্বীকার করা হয়নি।

## মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত কেন সাহায্য করে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন লেখক বিশেষ করে ভারতীয় জাত্যাভিমান প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গীর লেখকগণ মনে করেন যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল একাত্তরে পাক-ভারত যুদ্ধের ফসল। আবার কোন কোন লেখক-চিন্তাবিদের মতে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে ভারতের সৃষ্টি। উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত লেখক ও গবেষকগণ মনে করেন যে, পাকিস্তানের হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবিক কারণেই ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। যাহোক, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন দান ও সহযোগিতার পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে চিহ্নিত করা যায়:

**১. রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ:** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্যের প্রধান বিবেচনা ছিল রাজনৈতিক। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে, ভারত তার জন্মশত্রু পাকিস্তানকে দু'পাশে রেখে শুরু থেকেই খুব অস্বস্তিতে ছিল। প্রথম থেকেই পাকিস্তান ভারতের জন্য যেমন ছিল সামরিক হুমকি তেমনি ছিল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিরও বিরোধী। পাকিস্তানের বিবেচনায় ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র এবং হিন্দুরা হচ্ছে মুসলিম বিরোধী। পাকিস্তানের এ বিবেচনা ভারতের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল না। তাছাড়া দু'সীমান্তে প্রতিরক্ষার জন্য ভারতকে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছিল। সুতরাং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সুযোগে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে ভারত সঙ্গে সঙ্গে তা লুফে নিয়ে পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে তৎপর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

**২. নকশাল আন্দোলন দমন:** ভারতে এক শ্রেণীর বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ মনে করেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ক্রমবর্ধমান নকশাল আন্দোলন ও নাগা বিদ্রোহকে দমন করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কারণ মুক্তিকামী বাঙালির আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হলে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের পূর্বাঞ্চল ভারতের জন্য সমস্যা হতে পারতো।

**৩. শরণার্থী সমস্যা:** ব্যাপক নিধন ও নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ ব্যাপক হারে বাঙালির দেশত্যাগ ও শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ভারতের জন্য ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় এক কোটির মত শরণার্থীর ভার বহন করতে ভারতের বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় হতে থাকে। শুধু তাই নয়, শরণার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের ওপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। শরণার্থীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতা প্রদর্শনের দাবি ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ওপর ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক দলসমূহ এ ইস্যুতে কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত করতে উদ্যত হয়।

অন্যদিকে সামরিক নিপীড়ন এবং সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া কোন রাজনৈতিক শক্তিই পাকিস্তানকে জোরালোভাবে চাপ প্রয়োগ করেনি। কিন্তু অন্তহীন শরণার্থীর স্রোত ভারতের জন্য সৃষ্টি করে এক কঠিন বাধ্যবাধকতা। এ অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত যে শরণার্থী ফেরত পাঠানো সম্ভব নয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সশস্ত্র সহযোগিতা প্রদান এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে ছাত্র, শ্রমিক ও যুবককে সশস্ত্র ট্রেনিং দানের নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করে।

**৪. মানবিক কারণ:** সাংবিধানিকভাবে ভারত হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। পক্ষান্তরে পাকিস্তান হচ্ছে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র- যা অধিকাংশ সময় শাসিত হয়েছে সামরিক শাসক দ্বারা। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা- যা ছিল ভারতের জন্য স্বস্তিদায়ক। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর ভারত চেয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক। তাহলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে আসবে, সামরিক উত্তেজনা কমবে এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় রাষ্ট্রের চরিত্র লোপ পাবে। কিন্তু পাক সামরিক শাসকবর্গ নির্বাচনে বিজয়ীদের ক্ষমতা প্রদান না করে ব্যাপকভাবে হত্যা, ধর্ষণ এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু করলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করে এবং হত্যা, ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতাকে সামগ্রিক সহযোগিতা করতে তৎপর হয়।

## মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

**১. প্রশিক্ষণ দান:** সেক্টর কমান্ডারদের অধীন নিয়মিত বাহিনীকে ট্রেনিং করানো, তরুণ সম্প্রদায়কে রিক্রুট করা ও প্রশিক্ষণ দান, বিভিন্ন গেরিলা সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭১ সালের ৩০ এপ্রিল এ ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদান করে এবং ৯ মে তাদের হাতে ন্যস্ত হয় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানেচ্ছুকদের ট্রেনিংয়ের দায়িত্ব। ইতোপূর্বে (এপ্রিল) বিএসএফ বিক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে সাহায্য করছিল সেনাবাহিনী দায়িত্ব গ্রহণের পর মে মাসে তার উন্নতি ঘটে। তবে তরুণদের ট্রেনিং-এর ব্যাপারে ভারতীয় প্রশাসন ছিল দ্বিধাবিভক্ত। নকশালবাদী, নাগা, মিজো প্রভৃতি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতের

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভারতীয় প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্রসমূহ সন্ত্রাসবাদী বা বিদ্রোহীদের হাতে যে পৌঁছাবে না- এ নিশ্চয়তার অভাবই তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তাই 'যুব শিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবির'-এর মাধ্যমে তরুণদের রিক্রুট এবং আওয়ামী পরিষদ দ্বারা সনাক্তের পর তাদেরকে ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি করা হতো যেন বামপন্থীরা ট্রেনিংয়ের সুযোগ না পায়। এজন্য প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে আগ্রহীদের তুলনায় ট্রেনিং-এর সুযোগ ছিল সীমিত।

**২. মুজিব বাহিনী গঠন:** ভারত যে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল তার প্রমাণ মুজিব বাহিনী গঠন। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে নেতৃত্ব যেন কমিউনিস্ট বা চরমপন্থীদের হাতে চলে না যায় সেজন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে সজ্জিত একদল তরুণ ও যুবকদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। অনেকের মতে, মুক্তিযুদ্ধের মাঝপথে খন্দকার মোশতাক সহ আপোষকামী কোন আওয়ামী লীগ নেতা বা অস্থায়ী সরকারের কেউ যাতে পাকিস্তানের সাথে আপোষ করতে না পারে সেজন্য মুজিব বাহিনী গঠন জরুরি হয়ে পড়েছিল। তবে মুজিব বাহিনী গঠন নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

**৩. অস্ত্র প্রদান:** মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করেছিল। শক্তিশালী পাকিস্তানি আর্মির মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমদানি এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সরবরাহ করে ভারত মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ সরবরাহের জন্য সামরিক খাতে ভারতকে শরণার্থীদের পিছনে ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ ব্যয় করতে হয়েছিল বলে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তা জানান।

**৪. শরণার্থীদের আশ্রয় দান:** শরণার্থীদের আশ্রয় দান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার আর এক অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিদিন ২০ হাজার হতে ৪৫ হাজার অসহায় নিরস্ত্র বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (২৬ মার্চ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ)। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলিয়ে প্রায় এক কোটির মত লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এ বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পিছনে ভারত সরকারের বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এসব শরণার্থীর জন্য ভারত ও বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে যে অর্থ সাহায্য করেছে তার পরিমাণ ভারতীয় টাকায় ৫০ কোটি টাকার মতো বলে ভারতের তৎকালীন পুনর্বাসন সচিব জি. এস. কাহলেন এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের ব্যয় হয় ২৬০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, মোট ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়েছিল ৫৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসা প্রায় নিঃস্ব এক কোটির মতো শরণার্থী- যার মধ্যে অনেকে অসুস্থ কিংবা আহত। তাদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা গৃহনির্মাণ ইত্যাদির জন্য ভারত সরকারকে ব্যাপক প্রস্তুতি ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। এব্যাপারে জাতিসংঘ সহ অন্যান্য বৈদেশিক সাহায্য এসেছিল অনেক পরে। তাই ভারত সরকার সময় মতো সহযোগিতা ও ত্যাগ স্বীকার না করলে শরণার্থীদের পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারকে চরম মূল্য দিতে হতো। হয়তো খাদ্য ও চিকিৎসাহীন অবস্থায় মারা যেত অনেকে।

**৫. বেতার কেন্দ্রের জন্য ট্রান্সমিটার প্রদান:** মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের (মুজিবনগর সরকারের) প্রচার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি বেতার কেন্দ্র। তাই ভারত সরকার ৫০ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে ছিল এর রেকর্ডিং স্টুডিও এবং ৩৯, সুন্দরী মোহনস্ট্রিটের ৮ তলা বাড়ির ছাদ হতে অনুষ্ঠান প্রক্ষেপণ করা হতো।

**৬. ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর:** ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টায় এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সাথে চীনের বরফ শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এর ফলে চীন ও আমেরিকার কাছে পাকিস্তান প্রিয় হয়ে ওঠে- যা ভারতের জন্য ছিল উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ২০ বছরের মৈত্রী চুক্তি করে- যার মূল বিষয় ছিল দু'দেশের কেউ আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে। এর ফলে মুক্তিকামী জনতার মনোবল বহুগুণে বেড়ে যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত আরও দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়।

**৭. আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রচারণা:** প্রথমদিকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কোন মিশন ছিল না। পরবর্তী সময়ে কিছু মিশন স্থাপিত হলেও তা ছিল খুবই সীমিত। তাই যেসব স্থানে ভারতের মিশন ছিল সেসব স্থানে ভারত বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এবং নিরীহ বাঙালির বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর অন্যায় আক্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তৎপরতা চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গকে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভারতের সরকার ও বিরোধী দলের নেতারা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথমে দিল্লিতে অবস্থানরত রাষ্ট্রদূতদের বোঝানো, তারপর বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের কাছে মন্ত্রী পর্যায়ের দূত পাঠানো এবং পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র সহ ৮টি দেশ সফর করার মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশগুলোকে তাঁর অবস্থান আংশিকভাবে হলেও বোঝাতে পেরেছিলেন। বিশ্ব জনমত গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, একইভাবে বিদেশী গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের শরণার্থীদের দুর্দশা, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শনসমূহ দেখানোর ব্যবস্থাও ভারতকে করতে হয়েছিল। আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছিল জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের।বাংলাদেশের পক্ষে মার্কিন জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির ভারত সফর খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। প্রখ্যাত ফরাসি বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, বলেছিলেন যে, বাংলাদেশ যদি মুক্তিযুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সবার আগে তিনি সেই ব্রিগেডে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন।এভাবে নানাবিধ তৎপরতার মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রচারণা চালিয়েছিল।

**৮. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান:** ভারত কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে। এর ফলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং মুক্তিকামী জনতার মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ভারত কঠোর ভাষায় গণহত্যার নিন্দা, নির্যাতিত এবং সহায় সম্বলহীন মানুষের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা সহ প্রয়োজনীয় সব কিছু করলেও মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি ভারতের জন্য ছিল খুবই স্পর্শকাতর। কারণ শরণার্থী সম্পর্কে বিস্তর সহানুভূতি, উদ্বেগ ও নিন্দা জ্ঞাপন সত্ত্বেও

পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না। পাকিস্তানের সাথে একই সুরে যুক্তরাষ্ট্র, চীন সহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ মনে করত যে, এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া মানেই পাক-ভারত যুদ্ধের ঝুঁকি যা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনকে উৎসাহিত করবে বলে ভারত মনে করতো। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।

**৯. মিত্র বাহিনী গঠন ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ:** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সবধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও ভারত ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তবে ২১ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথকমান্ড গঠিত হয়েছিল। কিন্তু যে কোন সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে- এমন একটি চিন্তা ও প্রস্তুতি ভারত সরকারের মধ্যে জাগ্রত ছিল। মুক্তিবাহিনীর পর্যায়ক্রমে আক্রমণে যশোরের চৌগাছা সহ একের পর এক এলাকা পাকবাহিনীর হাতছাড়া হতে থাকলে পাকিস্তান হঠাৎ করে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি শহর আক্রমণ করে ৩ ডিসেম্বর। ফলে শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ হতে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী একসাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। মাত্র ১৮ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে পাক বিমান বাহিনী প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলায়। ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। একের পর এক রণাঙ্গনে পরাজিত হতে থাকে পাক-বাহিনী। বাংলাদেশের বিজয় হয়ে দাঁড়ায় সময়ের ব্যাপার মাত্র। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আসে সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ৯৩ হাজার সৈন্য সহ পাকবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ যুদ্ধে ভারতের প্রায় ৪ হাজার অফিসার ও জোয়ান এবং অসংখ্য বেসামরিক লোক শহীদ হয়।

## ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি পর্যায়েও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি গঠিত হয়। ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবি শংকর আমেরিকার লস এঞ্জেলস-এ বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লক্ষ ডলার ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য। মকবুল ফিদা হুসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকগণ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায় ও গণেশ পাইনের মতো খ্যাতিমান শিল্পীরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাসের পর মাস বাংলাদেশের ওপর ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন এবং ছবি বিক্রির টাকা শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দিয়েছেন। শিল্পী বাঁধন দাস ছবি আঁকা ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছিলেন তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে। অন্নদাশংকর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, রমেন মিত্র প্রমুখ কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও দিল্লির শিল্পী ধীরাজ চৌধুরী, জগদীশ দে এবং বিমল দাস গুপ্তের মত শিল্পীরা দিল্লি, বোম্বে এবং কলকাতায় প্রদর্শনী করে ছবি বিক্রির টাকা তুলে দিয়েছিলেন

বাংলাদেশ তহবিলে। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, গাইয়েরা বাংলাদেশের ওপর, বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন, নাট্যকর্মীরা নাটক করেছেন, ঋত্বিক ঘটক, শুকদেব আর মেহতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের ভেতর এমন ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাবে যাঁরা কোনও না কোনও ভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেন নি।

## সারসংক্ষেপ

*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ, গভীর ও ঘনিষ্ঠ। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রচেষ্টার পাশাপাশি ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রচার মাধ্যম ও কূটনৈতিক মাধ্যমে ভারত বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে গণহত্যা চলছে তা প্রতিহত করা বাইরের শক্তির নৈতিক দায়িত্ব। ভারত মানবিক প্রেক্ষাপট হতেই বিষয়টি বিচার করছিল বলে জানিয়েছিল। কিন্তু ভারতের ওপর শরণার্থী সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত এ সমস্যার আর কোন সমাধান ভারতের হাতে ছিল না। সুতরাং গণহত্যার বিরুদ্ধে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি শরণার্থী সমস্যা ও অন্যান্য আরও কিছু কারণে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করে। এমনকি ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ হতে বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে যৌথ বাহিনী গঠন করে এবং সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। এ যুদ্ধে ভারতের নিয়মিত বাহিনীর প্রায় ৪ হাজার সৈন্য এবং আরও অনেক বেসরকারি লোকের প্রাণহানি ঘটে। প্রচুর অর্থ ও গোলাবারুদ ব্যয় হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ত্যাগ স্বীকার ছিল অতুলনীয়।*

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

১। প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ মোনায়েম সরকার ও ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

২। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা।*

৩। মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১।*

৪। এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান।*

৫। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ৮ম ও ত্রয়োদশ খন্ড।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে কি পরিমাণ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল?

(ক) প্রায় এক কোটি — (খ) প্রায় এক লক্ষ
(গ) প্রায় তিন লক্ষ — (ঘ) প্রায় এক হাজার।

২। ভারত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য কত শক্তির ট্রান্সমিটার প্রদান করেছিল?
(ক) ৫০০ কিলোওয়াট — (খ) ৫০ কিলোওয়াট
(গ) ৫ কিলোওয়াট — (ঘ) ১০০ কিলোওয়াট।

৩। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়-
(ক) ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ — (খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
(গ) ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ — (ঘ) ২৬ মার্চ ১৯৭১।

৪। ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কত বছরের জন্য?
(ক) ২০০ বছর — (খ) ৫০ বছর
(গ) ১০ বছর — (ঘ) ২০ বছর।

৫। শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য ভারতের সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবিশংকর কি পরিমাণ অর্থ ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন?
(ক) ১০ লক্ষ ডলার — (খ) ২০ লক্ষ ডলার
(গ) ১০ হাজার — (ঘ) ১০ কোটি ডলার।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। ভারত কেন মুজিব বাহিনী গঠনে সহায়তা করেছিল?

২। আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে ভারত কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছিল?

৩। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল কেন?

৪। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদান মূল্যায়ন করুন।

## রচনামূলক প্রশ্ন:

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত কিভাবে সাহায্য করেছিল?

## *পাঠ-২*

# *মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা*

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল তা জানতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

ভৌগোলিক দিক দিয়ে চীনের মত সোভিয়েত ইউনিয়নও দক্ষিণ এশিয়ার নিকটবর্তী একটি পরাশক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই ইউরোপীয় পরিমন্ডল ছাড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি নতুন পরাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। মধ্য ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে একই সঙ্গে ইউরোপীয় ও এশীয় শক্তি হিসেবে দাবী করে। তবে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দক্ষিণ এশীয় ভূ-খন্ডে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কূটনৈতিক প্রয়াসের পেছনে মৌল ভিত্তিই হলো এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাইরের পৃথিবীকে জানাতে চেয়েছিল যে, ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে দক্ষিণ এশিয়া তার প্রভাব-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ষাটের দশকে আমেরিকা যতই ভিয়েতনাম সমস্যায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ততই দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। কিন্তু সত্তর দশকের শুরুতে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন- এ দু'পরাশক্তির মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা যেমন হ্রাস পেতে থাকে, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সম্পর্কেরও চরম অবনতি ঘটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সুতরাং চীন, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি আমেরিকাও এ যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিল। তবে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাঙালি গণহত্যাকে নিন্দা জানায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগাগোড়াই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল।

## সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল?

সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল তা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই রুশ-ভারত মিত্রতা ও মার্কিন-পাকিস্তান মিত্রতা এবং রুশ-চীন ও ভারত-চীন বৈরীতার বিষয়টি স্মরণ রাখা দরকার। ষাটের দশকে পাকিস্তান চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সমানভাবে উন্নত

সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু রুশ-চীন বিবাদের ফলে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৯-এর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ এশিয়া নিরাপত্তা জোটে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই জোটটি চীন বিরোধী হওয়ায় পাকিস্তান জোটে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের সহানুভূতি হারায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের মাধ্যমেই চীন-আমেরিকা সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ায় পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাগভাজন হয়। সুতরাং ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন মস্কো-ইসলামাবাদ সম্পর্কের বেশ অবনতি ঘটেছিল। তবে তার মানে এই নয় যে, মস্কো পাকিস্তানকে মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিল। তার প্রমাণ ১৯৭০ সালেও দু'দেশের মধ্যে পাঁচশালা বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আর এমনই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে সতর্কতামূলক এবং পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। যাহোক, সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের পিছনে নিুলিখিত কারণ সমূহকে চিহ্নিত করা যায়-

**১. আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন:** সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় লক্ষ কোন সময়ই পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সত্তার বিরোধী ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকবর্গ ছিলেন অতিমাত্রায় ভারত বিরোধী ও চীন ঘেষা। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভারত ও মস্কো ঘেষা আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাতে তৎপর হয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারণা ছিল যে, পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। কিন্তু ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান কর্তৃক সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানোয় শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। তাই এ যুদ্ধকে সমর্থন করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন বিকল্প ছিল না।

**২. ভারতের পূর্ব প্রান্তে বিপ্লবী চেতনার প্রসার রোধ করা:** বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্রমে তা গণযুদ্ধে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর তা হলে আসাম সহ ভারতের পূর্ব প্রান্ত বিপ্লবী চেতনা ও বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হতো- যা ভারতের জন্য হতো বিরাট বিপদের কারণ। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তিযুদ্ধের অবসান এবং সম্ভব হলে অখন্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আওয়ামী লীগকে স্থাপন করে সমস্যার সমাধান। আর এজন্যই পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৎপর হয়ে উঠেছিল।

**৩. রুশ-চীন বিরোধ:** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে রুশ-চীন বিরোধ। সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল চরম বৈরীতার। অবস্থাটা এমন ছিল যে, কোন একটি দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হলে সে দেশটি চীনের শত্রুতে পরিণত হবে। আর এ কারণেই পাকিস্তান চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন মনেপ্রাণে চাচ্ছিল পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে। কিন্তু চীন-পাকিস্তান মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বেকায়দায় পড়ে যায় এবং বাধ্য হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঙালির প্রতি মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, বরং নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও প্রভাব বলয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল।

## মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির বিভিন্ন পর্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি সব সময় একই গতিতে প্রবাহিত হয়নি। সময় ও বাস্তবতার সাথে সাথে বিভিন্ন সময় সোভিয়েত নীতিতে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

**সোভিয়েত নীতির প্রথম পর্যায় (মার্চ-জুন):** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির প্রথম পর্যায়ে সতর্কতা ও সুবিধাবাদ লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে ব্রেজনেভ যে ভাষণ দেন সেখানে জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে সব এশীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় নীতি ছিল খুবই সতর্কতার নীতি। তারা জনগণের অধিকার সমুন্নত রেখে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দকে প্রাথমিক পর্যায়ে একটু দ্বিধান্বিত করেছিল। তারা চাননি যে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক কিংবা বাংলাদেশের মত যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের জন্ম হোক। কারণ এমনি দরিদ্র দেশ অনতিকালের মধ্যেই পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের কুক্ষিগত হবে। আর এ বিবেচনা থেকেই প্রেসিডেন্ট পদগর্নি ২ এপ্রিল ইয়াহিয়াকে একটি পত্র লিখেন এবং জরুরী ভিত্তিতে রক্তপাত ও নির্যাতন বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পাকিস্তানকে আহবান জানান। পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এমন একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা উচিত যেন পূর্ব পাকিস্তানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, পদগর্নির পত্রে,'বাঙালি বা বাংলাদেশ' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি; বরং 'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পাকিস্তানের আপামর জনগণ' শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের এই যে নীতি, এটা ছিল সতর্কতা ও সুবিধাবাদের নীতি।আর এই সুবিধাবাদী নীতির কারণে ১৯৭১ সালের এপ্রিল হতে আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিয়েছে এবং এই সময়েই পাকিস্তানে প্রথম স্টীল কারখানা ও পারমানবিক শক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত সোভিয়েত সাহায্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে ভারসাম্য সৃষ্টিকারী সোভিয়েত নীতি ভারতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করলেও ভারতের আপত্তি উপেক্ষা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নীতিতে অটল থাকে।

**সোভিয়েত নীতির দ্বিতীয় পর্যায় (জুলাই-আগস্ট):** মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির দ্বিতীয় পর্যায়কে অধিক সতর্কতার নীতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় নীতির ক্রান্তিকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। জুলাই মাসে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান সফর করার পরই প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রস্তাবিত চীন সফরের সংবাদ প্রচারিত হয়- যা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ছিল বিব্রতকর। অন্যদিকে পিকিং থেকে ফিরেই হেনরি কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে চীন হস্তক্ষেপ করবে এবং আমেরিকা ভারতের সাহায্যে নাও এগিয়ে আসতে পারে। এর ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। সোভিয়েত ইউনিয়নও এ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ফলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হল ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিয়েছে বলে সমালোচনা হলে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, "India will continue to follow its policy of non-alignment as before." তবে বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, চীন-মার্কিন আঁতাতের জবাবেই মূলত এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

কিন্তু ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজস্ব বিবেচনার দ্বারাই প্রধানত পরিচালিত হতে থাকে। আর এ কারণেই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের এক সপ্তাহ পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানের জন্য তাদের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

তবে সোভিয়েত নীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আর তা'হলো বাঙালি বিরোধী কোন আন্তর্জাতিক সমাধানের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নও তৎপর হয়ে ওঠে। অবশ্য এ সহমর্মিতার কারণ হচ্ছে- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই চেয়েছিল মস্কো ও দিল্লি ঘেষা আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক। তবে ভারত চেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার আর সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ছিল অখন্ড পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার। আর এ কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্টোবরে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল যেন ভারত স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা না করে।

**সোভিয়েত নীতির তৃতীয় পর্যায়ে (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর):** সোভিয়েত নীতির তৃতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে। এসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতিতে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়; যথা-

১. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের এই নীতি গ্রহণ করে যে, বাংলাদেশ সমস্যার মধ্যে যেহেতু আন্তর্জাতিক সংকটের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। কাজেই বিষয়টি জাতিসংঘের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

২. ভারত সরকারের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা করে যে, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের আদর্শ যেন হয় মস্কো ঘেষা। আর এ নীতির কারণেই সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোপন্থী আওয়ামী লীগ সদস্যদের নিয়ে একটি মুক্তিসংগ্রাম উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। একই সময়ে জাতিসংঘে প্রেরিতব্য বাংলাদেশী মিশনের সদস্য রদবদল করার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে মিশন থেকে ড. এ.আর. মল্লিক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও খন্দকার মোশতাককে বাদ দিয়ে মস্কোপন্থী অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সুবিধাবাদী নীতি অব্যাহত রেখেই চেষ্টা করে যেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ না বাঁধে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যকে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছিল। কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর মধ্য দিয়ে এ ধরনের কূটনীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

**সোভিয়েত নীতির শেষ পর্যায় (৩ ডিসেম্বর-স্বাধীনতা পর্যন্ত):** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির শেষ অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর সময় হতে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়কালকে। এ সময়ে তিন পরাশক্তির বিভিন্নমুখী তৎপরতা সারা বিশ্বে সংবাদ শিরোনাম হয়। পাকিস্তান ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টিতে এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া। আর এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র বা চীন উত্থাপিত যে কোন যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিতে শুরু করে। ভেটো দেয়ার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল যে, যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে এটাও নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে যে, বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে

বাঙালিদের মতামতই চূড়ান্ত। অবশ্য ৬ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটো প্রস্তাব উত্থাপন করে যেখানে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছিল। এটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিধাবাদী নীতিরই অংশ। কিন্তু আমেরিকা ও চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের এ প্রস্তাবকে দূরভিসন্ধিমূলক বিবেচনা করায় শেষপর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে- যেন ভারতীয় বাহিনী সামরিক বিজয়ের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। পরিস্থিতিগত কারণে এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বিজয়ের মধ্যদিয়েই তাদের লক্ষ অর্জিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; ফলে যুদ্ধবিরতির যে কোন আন্তর্জাতিক পদক্ষেপকে প্রতিহত করা সোভিয়েত নীতির লক্ষে পরিণত হয়। তাই নিরাপত্তা পরিষদের পরিবর্তে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ৭ ডিসেম্বর একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয়বারের মত ভেটো প্রয়োগ করে। ভারতীয় বাহিনী ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহুর্ত্ত পর্যন্ত যে কোন প্রকার যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে বানচাল করাই ছিল এ ভেটো দানের উদ্দেশ্য। আর তাই ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ভেটো প্রয়োগ না করায় শেষপর্যন্ত ২১ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঢাকার পতন যখন আসন্ন হয়ে উঠছিল ঠিক তখনই ১২ ডিসেম্বর দিল্লি সফরে আসেন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপ-প্রধানমন্ত্রী ভাসিলি কাজনেতসভ। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি দিল্লি অবস্থান করেন। এ সফরে তার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দু'টি, যথা-

১. বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃতি যেন মস্কোপন্থী হয়, সেজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ভারতকে সাহায্য করা এবং

২. পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে চূড়ান্ত আঘাত করা থেকে ভারতকে বিরত রাখা। এক্ষেত্রে অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্য দু'টি পরাশক্তির সঙ্গে একত্রে ভূমিকা পালন করেছিল।

সুতরাং দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পরাশক্তির যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল সে দ্বন্দ্বে দক্ষিণ এশীয় ভূ-খন্ডে সোভিয়েত ইউনিয়নের কৌশল ও কূটনীতির জয় হয়েছিল।

## বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির মূল্যায়ন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির বাস্তব ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন খুবই কঠিন। কারণ ভারতীয় লেখক ও গবেষকগণ যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি মহানুভব শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি জি.ডব্লিউ. চৌধুরী সহ পাকিস্তানপন্থী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী লেখকগণ অনাবশ্যকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার অবমূল্যায়ন করেছেন। তবে এসব সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা যায়। যথা-

১. মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়েও সোভিয়েত কূটনীতিতে সুবিধাবাদের নীতি বিদ্যমান ছিল।

২. সোভিয়েত নীতি প্রণয়নে মতাদর্শের চেয়ে জাতীয় স্বার্থই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

৩. ভারত মহাসাগরের তীর ঘেষে বিস্তৃত উপমহাদেশের বিশাল উপকূল ভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ছিল বিশেষভাবে লোভনীয়। তাই এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজন ছিল নৌ-বন্দর ও নৌ-

ঘাঁটির। আর এ কারণেই উপমহাদেশের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ ছিল এবং এজন্যই সে ভারত ও পাকিস্তান উভয় শক্তির সাথেই সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী ছিল। এজন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই খোলাখুলি সমর্থন করেনি বা খোলাখুলি পাকিস্তানের বিরোধিতা করেনি।

৪. রুশ নীতি আগাগোড়া সুবিধাবাদের ওপর গড়ে উঠলেও মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধুমাত্র কৌশলগত কারণে বাংলাদেশপন্থী নীতি গ্রহণ করে।

## সারসংক্ষেপ

পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম বাঙালি গণহত্যাকে নিন্দা করে। এজন্য মনে করা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগাগোড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। সোভিয়েত নীতির পটভূমিতে বিদ্যমান ছিল সোভিয়েত-চীন বিবাদের অভিজ্ঞতা। ১৯৬৯ সালের মার্চে উসুরী নদী বরাবর সোভিয়েত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে  সোভিয়েত-চীন বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। আর তখন থেকেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনকে প্রতিহত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পরিকল্পনা করে তারই অংশ হিসেবে চীন সমর্থিত পাকিস্তানের বিপক্ষ শক্তি ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অধিক নির্ভরশীল মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। আর ভারতের আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ রেখেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনেকটা শেষপর্যায়ে এসে সমর্থন করে। কিন্তু এ সমর্থন সত্ত্বেও বলা যায় যে, সোভিয়েত নীতি ছিল আগাগোড়াই সুবিধাবাদী এবং অখন্ড পাকিস্তান নীতির সমর্থক। আর এ কারণেই ৬ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন যে দু'টি প্রস্তাব উত্থাপন করে সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের কথাই বলা হয়েছিল- যা ছিল চীন ও আমেরিকারও দাবি। কিন্তু তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব বুঝতে পারেনি বলেই হয়তো প্রস্তাব দু'টির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। আসলে কোন পরাশক্তিই বাঙালির প্রতি মমত্ববোধ কিংবা বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ভূমিকা পালন করেনি। প্রত্যেকের ভূমিকার পিছনেই ছিল নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আদর্শিক ব্যাপারটি মুখ্য হলে কৃষক-শ্রমিক তথা সর্বস্তরের বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করত। তবে একথাও সত্য যে, সোভিয়েত নীতি আগাগোড়া সুবিধাবাদী হলেও মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত নীতি ছিল পুরোপুরিই বাংলাদেশপন্থী। বিশেষ করে যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাধাহীন করে তুলতে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং স্বাধীনতা লাভের পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভূমিকা পালন করেছিল তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

১। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা।*

২। প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহ্‌মদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)।*

৩। মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এস.সি, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, বিরোধী শক্তি ও বৃহৎশক্তির প্রতিক্রিয়া।*

৪। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি।*

৫।  এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান।*

৬। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খন্ড।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত তারিখে?
(ক) ৯ আগস্ট ১৯৭১ (খ) ৬ আগস্ট ১৯৭১
(গ) ৪ জুলাই ১৯৭১ (ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭১।

২। জাতিসংঘে উত্থাপিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বমোট কতবার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে?
(ক) ২ বার (খ) ৩ বার
(গ) ৪ বার (ঘ) ৫ বার।

৩। ১৯৭১ সালের কোন মাসে রুশ-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ হয়?
(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি
(গ) মার্চ (ঘ) ডিসেম্বর।

৪। জাতিসংঘে বাংলাদেশ বিষয়ে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গৃহীত হয় কত তারিখে?
(ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ (খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পরাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে কোন শক্তির কূটনীতি?
(ক) ভারত (খ) চীন
(গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন (ঘ) আমেরিকা।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

৩। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন সমর্থন করেছিল?

**রচনামূলক প্রশ্ন:**

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করুন।

২। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল কেন? মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত নীতির মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৩

## *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি তা জানতে পারবেন;*
- *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন নীতির বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে অবহিত হবেন;*
- *যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিগণ মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল তা বলতে পারবেন;*
- *মার্কিন রাজনীতিবিদগণ মুক্তিযুদ্ধে কি ভূমিকা পালন করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *মার্কিন কংগ্রেস ও মার্কিন সিনেট মুক্তিযুদ্ধে কি ভূমিকা রেখেছিল তা জানতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বিবেচনায় খুব হতাশাব্যঞ্জক। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখন্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের সমর্থন ছিল খুবই শক্তিশালী এমনকি মার্কিন প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর ব্যতীত সরকারের অন্যান্য স্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল ব্যাপক সমর্থন। পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম এবং জনমনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। আমেরিকার বাঙালি মহলও সর্বতোভাবে মুক্তিযুদ্ধে নানা ধরনের সহায়তা করে। এমনকি পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত বাঙালিরা এক পর্যায়ে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র আমেরিকানরা বাঙালিদের বন্ধু অথবা সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে জনমত গঠন করে ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং শরণার্থী কেন্দ্রে বাঙালিদের নানা ধরনের সাহায্য করে। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার সহ মার্কিন প্রশাসনের নীতি নির্ধারক মহল ব্যতীত পাকিস্তানের বর্বর হামলা ও অমানবিক কর্মকান্ডের সমর্থন আমেরিকার কোথাও তেমন দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো নয় মাস নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের জন্য নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমর্থন যুগিয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন না করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক হওয়ার পিছনে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে চিহ্নত করা যায় :

### ১. তৎকালীন মানসিকতা ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমসাময়িক মানসিকতা ও বাস্তবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা সমসাময়িককালে মানবাধিকারের বিষয়টি বর্তমানের মত এত গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হতো না। অর্থাৎ মানবাধিকার নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ তখনো তেমন দানা বাঁধেনি। এমনকি স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুবই ট্রাডিশনাল। মুক্তিযুদ্ধে

লিপ্ত নানা গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়ার রেওয়াজ তখনো গড়ে ওঠেনি। বরং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারীদেরকে তখন বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। একটি দেশের এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠী কর্তৃক গণহত্যা মনে করা হতো সেদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাই এ নিয়ে অন্য কারো উচ্চাবাচ্যের অধিকার স্বীকৃত হতো না। এ ধরনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আমেরিকা সহ প্রায় সব দেশই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সমর্থন দিতে ইতস্ততঃ করে।

**২. পাকিস্তানের সাথে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্কে**

পাকিস্তানের সাথে ছিল আমেরিকার বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কারণ এশিয়া তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আমেরিকার বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল পাকিস্তান। এমনকি আমেরিকা যখন এশিয় রাজনীতিতে আরও বেশী প্রধান্য স্থাপনের জন্য নতুন মিত্র খুঁজছে ঠিক সেসময়ে পাকিস্তানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের সূচনা। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় এবং হেনরি কিসিঞ্জারের দূতিয়ালিতে আমেরিকার সঙ্গে চীনের বরফ শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যস্থতার সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান দুই বৃহৎ শক্তির বিশিষ্ট বন্ধুতে পরিনত হয়। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে এ বিশেষ সম্পর্কের কারণে চীন ও আমেরিকার কেউই পাকিস্তান বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেনি।

**৩. আমেরিকার সোভিয়েত-ভারত বিরোধী নীতি**

বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পরস্পর বিরোধী শিবিরের নেতৃত্বে। বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে উভয়ের মধ্য স্নায়ুযুদ্ধ বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয় রাজনীতিতে ভারত ছিল আমেরিকার স্বার্থ পরিপন্থী। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমপ্রসারমান রুশ প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা আমেরিকার স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল।

সুতরাং উপর্যুক্ত নানা বিষয়ে ভেবে চিন্তেই আমেরিকার সরকারি মহল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন নীতি ও কর্মকান্ডকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

**ক. মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত:** মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত ছিল মার্কিন নীতির প্রথম পর্যায়। এ পর্যায়ে মার্কিন নীতির প্রকৃতি ছিল কৌশলগত নিরপেক্ষতা। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা বিবেচনার জন্য ৬ মার্চ ১৯৭১ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন নীতি নির্ধারণী সংস্থা 'সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ'এর একটি সভা আহবান করেন। এ সভায় আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট এ্যালেক্সিস জনসন এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, অখন্ড পাকিস্তানের অব্যাহত অস্তিত্বের মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ায় রুশ, মার্কিন ও ভারতীয় স্বার্থ নিরাপদ থাকবে। ৮ এপ্রিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জোসেফ সিসকো সমস্যাটিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কীটিং ওয়াশিংটনের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা কোনভাবেই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হতে পারে না এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অজুহাতে সারা বিশ্ব দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে প্রবল জনমতের চাপে ওয়াশিংটন পাকিস্তানের জন্য সমরাস্ত্র সরবরাহ ও আর্থিক সাহায্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১২ জুন ১৯৭১ নিক্সন প্রশাসন আবারও পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের আহবান জানায়। তবে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ থাকলেও প্রচুর মার্কিন অস্ত্র পাকিস্তানে যাচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা শুরু হলে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয় যে, অস্ত্রগুলো সরবরাহের জন্য ২৫ মার্চের আগেই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল। তাছাড়া অক্টোবর মাসে সৌদি আরব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা ৭৪টি জঙ্গী বিমান পাকিস্তানকে পাঠানো হয়- যা ছিল গোপনে ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহমূলক পদক্ষেপের একটি অংশ।

তবে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো সত্ত্বেও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য এসময় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাঠানো অব্যাহত ছিল। অবশ্য এর উদ্দেশ্য ছিল হোয়াইট হাউস বিরোধী সমালোচনার তীব্রতা কমিয়ে আনা এবং সাহায্য দান অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

প্রথম পর্যায়ের মার্কিন নীতির বৈশিষ্ট্য: প্রথম পর্যায়ে মার্কিন নীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যথা-

১। বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা

২। ত্রাণ কাজে আর্থিক সাহায্য অব্যাহত রাখা।

৩। প্রকাশ্যে সামরিক সাহায্য স্থগিত থাকলেও বিভিন্ন পথে পাকিস্তানের জন্য সামরিক সাহায্য নিশ্চিত করা।

**খ. জুলাই হতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত পর্যায়:** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন নীতির দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায় শুরু হয় জুলাই মাস হতে- যা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এমনকি তারপরেও অব্যাহত ছিল। এ পর্যায়ে মার্কিন নীতির দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের হঠাৎ করে বেইজিং সফরের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান-ঘেঁসা নীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

২। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা হয়েছিল যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে জুলাই মাসে রুশ-ভারত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। তাই এ পরিকল্পনা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র তৎপর হয়।

আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে মার্কিন কূটনীতিকগণ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষে কলকাতায় অবস্থিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কেবলমাত্র শেখ মুজিবের সাথেই এ ধরনের আলোচনা হতে পারে বলে অস্থায়ী সরকার জানানোর পর মার্কিন এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তবে ২৩ নভেম্বর হতে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়। উপরন্তু নিক্সন প্রশাসন ব্যক্তিগত বার্তার মাধ্যমে পাকিস্তান, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে হিংসাত্মক সমাধানের পথ এড়িয়ে চলতে একাধিকবার অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ ছিল অখন্ড পাকিস্তানের অধীনে একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু কোনটিই সম্ভব হলো না । কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়েও মার্কিন নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর পর নিক্সন প্রশাসনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হলো যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান সফল হবার পর পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চরম আঘাত হানা হবে। তাই যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র প্রচন্ড ভারত বিরোধী ও পাকিস্তান ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। পাকিস্তানকে যাবতীয় নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দানের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন হেনরি কিসিঞ্জারকে নির্দেশ দেন। নিক্সনের এ নীতিকে Tilt Policy নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৬ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জন্য ৮৬.৬ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে। অপর দিকে জাতিসংঘের মাধ্যমে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগও অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য, ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ ভারতকে প্রধান আক্রমণকারী বলে উল্লেখ করেন। ৭ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে কিসিঞ্জারও ভারতকে আক্রমণকারী ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের একটি বড় চিন্তা ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত তৎপরতা। তাই দিল্লি ও মস্কোর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে যুক্তরাষ্ট্র 'এন্টারপ্রাইজ' নামক পারমানবিক জাহাজের নেতৃত্বে ৮টি জাহাজের একটি 'টাস্ক ফোর্স' বঙ্গোপসাগরে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এটা 'টাস্ক ফোর্স-৭৪' নামে পরিচিত। একই সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতির লক্ষে জাতিসংঘে মার্কিন কূটনীতি সক্রিয় থাকে। উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতির লক্ষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৪ ও ১২ ডিসেম্বর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু সোভিয়েত ভেটোর কারণে দুটো প্রস্তাবই নাকচ  হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারত মহাসাগরে মার্কিন ও সোভিয়েত নৌবহরের উপস্থিতি ঘটে- যা বল প্রয়োগিক কূটনীতি বা বোম্বেটে কূটনীতি (Gunboat Diplomacy) নামে পরিচিত। উভয় পরাশক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নৌ সমর উপকরণের সমাবেশ করেছিল। মার্কিন নৌবহরে ছিল চৌদ্দটি বড় ও কয়েকটি ছোট যুদ্ধ জাহাজ এবং সোভিয়েত নৌবহরে ছিল মোট ২৬ টি জাহাজ। যাহোক, দু'পক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত থাকলেও শেষপর্যন্ত আর সংঘর্ষ হয়নি। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ মার্কিন 'টাস্ক ফোর্স-৭৪' ভারত মহাসাগর ত্যাগ করে।

যাহোক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন নীতি একদিকে যেমন বাংলাদেশ বিরোধী ছিল, তেমনি নিজ দেশের জনগণ কর্তৃকও নীতিটি পরিত্যক্ত হয়েছিল।

**যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা**

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করলেও মার্কিন সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ সহ বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এমনকি অনেক আমলাও বাঙালির সংগ্রামের প্রতি সহনশীল ছিল। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

মার্কিন সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার, ওয়ালস্ট্রীট জার্নাল ইত্যাদি সংবাদপত্র বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করত। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বদেশের নাগরিক হত্যার জন্য ইয়াহিয়াকে দায়ী করে। আমেরিকায় কূটনীতিকগণের একযোগে বাংলাদেশের সপক্ষে আনুগত্য পরিবর্তনকে ৯ আগস্ট 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদকীয়তে একটি নাটকীয় ঘটনা ও

প্রতিবাদের বলিষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য যে, মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ প্রধানত মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে একটি সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। তবুও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ৫ এপ্রিল, ২ আগস্ট ও ৬ ডিসেম্বর মোট তিনবার নিউইয়র্কের প্রচ্ছদে বাংলাদেশ সংকট স্থান পায়। ২ আগস্ট ও ৬ ডিসেম্বর মোট ২ বার এ সুযোগ হয় টাইমসে। জাতীয় সংবাদপত্র ছাড়াও মফস্বলের সংবাদ মাধ্যমেও বাংলাদেশ সংকট হরহামেশা স্থান পেত। ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং (এনবিসি), ফক্স টেলিভিশন প্রভৃতি মিডিয়াতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে অনেক আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশিত হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, সরকারি নীতি বিপক্ষে থাকলেও মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ছিল বাংলাদেশের পরম বন্ধু।

মার্কিন বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এসোসিয়েশান ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রায় দু'হাজার শিক্ষাবিদ অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের জন্য আবেদন জানান। এই সম্মেলন জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে অনুরোধ করে। হার্ভার্ড অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড ম্যাসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গোনিল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইয়াহিয়া সামরিক চক্রের দমন নীতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবধারিত। এছাড়াও ত্রিশজনের মতো বুদ্ধিজীবী দলবদ্ধভাবে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপেক্ষা করার কোন অধিকার পাকিস্তানের নেই।

এছাড়া হার্ভার্ড ও শিকাগোর অধ্যাপকবৃন্দ বাংলাদেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বলা যায় শিক্ষাঙ্গনে মার্কিন পন্ডিত ব্যক্তির মধ্যে পাকিস্ড়ানের সমর্থক পাওয়া দুষ্কর ছিল। এসব পন্ডিতগণ বিভিন্ন বিবৃতি-বক্তৃতা ও সম্মেলনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিউইয়র্কে ডঃ হোমার জ্যাকের 'ওয়ারলড কনফারেন্স অব রিলিজিয়ন ফর পিস', জন সালজবুর্গের 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস' হয়ে উঠে বাংলাদেশের বিশেষ বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আড্ডাখানা। ২২ এপ্রিল ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অন ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সী (আই.সি.ইউ.ই) ঢাকায় শিক্ষক ও ছাত্র হত্যার ওপর একটি বিবৃতি প্রচার করে। এখানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পন্ডিতসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ'-এর বেশী শিক্ষাবিদ দস্তখত করেন। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জর্জ হ্যারিসনের 'বাংলাদেশ কনসার্ট' ছিল মুক্তিযুদ্ধে এক বিরাট অনুপ্রেরণা। এভাবে মার্কিন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। মার্কিন রাজনীতিবিদ বিশেষ করে কয়েকজন সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য সরকারি নীতির কঠোর সমালোচনা করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর সাক্সবে, সিনেটর কেইস, কংগ্রেসম্যান গ্রাস হেলপান ও গালাকার, সিনেটর হ্যারিস, সিনেটর পার্সী, সিনেটর মাস্কী, ওয়াল্টার মনডেল ও এডওয়ার্ড ব্রুক প্রমূখ। তবে এডওয়ার্ড কেনেডিই ছিলেন মার্কিন প্রশাসনের সবচেয়ে শক্তিশালী সমালোচক। সিনেটর কেনেডির শরণার্থী সাব-কমিটি ভারতে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ২৮ জুন, ২২ জুলাই এবং ৩০ অক্টোবর মোট তিনটি শুনানির ব্যবস্থা করেন। শেষ শুনানি অবশ্য ৩০ অক্টোবর ও ৮ নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শুনানিতে পাকিস্তানে অব্যাহত সামরিক সরবরাহ, দ্বিতীয়টিতে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা এবং তৃতীয় শুনানিতে সংকট সমাধানের রাজনৈতিক উদ্যোগ ও ভারত-মার্কিন সম্পর্কের পূনর্মূল্যায়ন স্থান পায়।

মার্কিন কংগ্রেসে প্রায় সারা বছরই বাংলাদেশ সংকট স্থান পায়। ১ এপ্রিল হতে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেসের উভয় কক্ষে বাংলাদেশ সংকট নিয়ে ২১০টি বিবৃতি প্রদান করা হয়। ৪৫ জন সিনেটর এবং ৩৬ জন প্রতিনিধি এ বক্তৃতাগুলো প্রদান করেন। পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য স্থগিত করা এবং যেসব সমরাস্ত্র

সরবরাহ হচ্ছিল তা বন্ধ করাই ছিল কংগ্রেসের প্রথম দাবি। এ বিষয়ে কংগ্রেসে মোট পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। যার মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটি ১৫ এপ্রিল ১৯৭১-এ পেশ করেন সিনেটর কেইস ও মনডেল। শেষপর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন এপ্রিল মাসেই ঘোষণা দেন যে পাকিস্তানে কোনো সামরিক সাহায্য দেয়া হবে না এবং সব সরবরাহ বন্ধ করা হচ্ছে। যে বিষয়টি প্রায় দু'মাস ধরে অনবরত তদ্বির হয় তা ছিল বৈদেশিক সাহায্য আইনের সংশোধন। যতদিন পর্যন্ত শরণার্থীরা নিরাপদে দেশে ফেরত না যাবে ততদিন পাকিস্তানে সব ধরনের সাহায্য রহিত করার জন্য ফরেন এসিস্ট্যান্স আইনে একটি সংশোধনী উত্থাপন করা হয়। ৩ আগস্ট প্রতিনিধি পরিষদে বৈদেশিক সাহায্য বিল বিবেচিত হয়। এছাড়াও পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে নির্বাহী বিভাগ ঢালাওভাবে ভারতকে যুদ্ধবাজ আখ্যা দিলে কংগ্রেসে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং প্রহসনমূলক বিচার বন্ধ করতে হস্তক্ষেপ করার জন্য ২৭ জুলাই ৫৫ জন কংগ্রেসম্যান এবং আগস্টে ১১ জন সিনেটর প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানান। এভাবে মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট ও মার্কিন রাজনীতিবিদগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

**সরকারি আমলাদের ভূমিকা**

মার্কিন প্রশাসনের অন্দরমহলের কিছু আমলা বিশেষ করে পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু আমলা এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মচারীগণ মার্কিন প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বা পাকিস্তান ঘেষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ১৯ জন কূটনীতিবিদের স্বাক্ষরসহ ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরকে এক কড়া পত্রে জানান যে, মার্কিন নীতি শুধু নৈতিকভাবেই অগ্রহণযোগ্য নয়, বরং মার্কিন স্বার্থেরও পরিপন্থী। এছাড়াও স্টেট ডিপাটমেন্ট, ইউ.এস.এ. আই.ডি. এবং কৃষি ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মকর্তা সরকারি নীতির সমালোচনা করেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, সরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা হলেও বেসরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল ব্যাপক সহানুভূতি। কংগ্রেস, সুশীল সমাজ ও প্রচার মাধ্যমের মনোভাব ও সতর্কতা এবং প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসন পাকিস্তানকে যতটা সমর্থন ও সহযোগিতা করতে চেয়েছিল ঠিক ততটা করতে সক্ষম হয়নি।

## সারসংক্ষেপ

*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল অখন্ড পাকিস্তান নীতিতে বিশ্বাসী। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। বরং পাকিস্তানকে নৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে সর্বদা সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ বিরোধী মার্কিন নীতি ছিল একান্তভাবেই হোয়াইট হাউসের, বলা যায়, স্রেফ নিক্সন-কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত নীতি। কেবলই পাকিস্তান প্রীতি ছাড়া তাদের এ নীতির কোন ভিত্তি ছিল না। চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্তান দূতিয়ালীর ভূমিকা পালন করা, সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য হওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পুরানো বন্ধু হওয়ার সুবাদে পাকিস্তান আমেরিকার সহানুভুতি পেয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের প্রতি এতটাই ঝুঁকে পড়েছিল যে, পারমানবিক যুদ্ধ জাহাজ সম্বলিত 'সপ্তম নৌবহর' ও 'এন্টারপ্রাইজ'কে বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সরকার পাকিস্তানপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট, প্রচার মাধ্যম, সর্বস্তরের জনগণ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম সমর্থক। এদের চাপেই আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোপনে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত ছিল।*

*মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে বাংলাদেশ সংকট নিয়ে ২১০টি বিবৃতি দেয়া হয়েছিল- এ থেকে বুঝা যায় যে, মার্কিন কংগ্রেস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি শক্তিশালী সমর্থকে পরিনত হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এবং ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য নিউজার্সির কংগ্রেসম্যান হেনরি হেল স্টোস্কি কর্তৃক সিনেটে প্রস্তাব পেশ ও সর্বসম্মতভাবে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তা পাশ হওয়া সত্ত্বেও নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল।*

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ**

১। প্রফেসর সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১-)*, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, সম্পাদিত।

২। আবুল মাল আব্দুল মুহিত সম্পাদিত, *Bangladesh liberation war and American Response.*

৩। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা।*

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:**

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (|) চিহ্ন দিন।

১। নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়-
(ক) ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ (খ) ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
(গ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

২। নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিতীয় মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়-
(ক) ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ (খ) ৭ মার্চ ১৯৭১
(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ২৬ মার্চ ১৯৭১।

৩। মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে-
(ক) চীন (খ) ফ্রান্স
(গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন (গ) ব্রিটেন।

৪। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জজ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়-
(ক) ওয়াশিংটনে (খ) ফ্লোরিডায়
(গ) মস্কোতে (ঘ) নিউইয়র্কে।

৫। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কোন কূটনীতিক প্রথম বাংলাদেশ বিষয়ে মার্কিন নীতির সমালোচনা করেন?
(ক) আর্চার ব্লাড (খ) মনডেল
(গ) এডওয়ার্ড কেনেডি (গ) গালাকার।

৬। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে-
(ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (খ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
(গ) ৪ এপ্রিল ১৯৭২ (ঘ) ৪ আগস্ট ১৯৭২।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন নীতির প্রথম পর্যায় আলোচনা করুন।

২। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন:**

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বেসরকারি পর্যায়ে মার্কিনীদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের মার্কিন নীতি আলোচনা করুন।

## *পাঠ-৪*

# *মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *মুক্তিযুদ্ধকালীন চীনের নীতি ও কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায় জানতে পারবেন;*
- *মুক্তিযুদ্ধে চীনের বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল চীন তাদের অন্যতম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে চীনের সরকারি অবস্থান ছিল পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক। বাংলাদেশের সংকট নিয়ে চীনের প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি চৌ এন লাই-এর চিঠির মাধ্যমে। ঐ চিঠিতে চৌ এন লাই পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে জানান এবং জনগণ বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই তা সমাধান করবে বলে উল্লেখ করেন। এমনকি পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' রক্ষায় চীনের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। অবশ্য চিঠিতে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোন বক্তব্য রাখেন নি। তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে চীন বাঙালির সংগ্রাম ও নির্যাতনের প্রতিও কোন সহানুভূতি দেখায় নি। বরং পাক সামরিক চক্রের প্রতি জানিয়েছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। এমনকি চীনপন্থী রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত মাওলানা ভাসানীর আকুল আবেদন সত্ত্বেও চীনা নীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে চীনের নীতি ও কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা-

**ক. মুক্তিযুদ্ধের শুরু হতে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত:** ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত চীন পাকিস্তানপন্থী থাকলেও মোটামুটিভাবে বাঙালির সংগ্রাম বিরোধী কোন মন্তব্য করেনি। এমনকি এপ্রিল হতে অক্টোবর পর্যন্ত চীন প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি। তবে গোপনে সে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে নৈতিক শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল এবং সরাসরি সামরিক উপকরণ সরবরাহ করেছিল। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পর চীনের পাকিস্তানপন্থী নীতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

সেপ্টেম্বর মাসে চীন পাকিস্তানকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, জাতীয় স্বার্থরক্ষায় চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। তখন পর্যন্তও চীনের বক্তব্যে বাঙালি বিরোধী তেমন বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এজন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার অনেক সময় আশা করতেন যে শেষপর্যন্ত হয়তো চীন সংগ্রামী বাঙালির পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। যাহোক, ৫ নভেম্বর চীনাদের আস্থাভাজন ভুট্টোর নেতৃত্বে একটি পাক প্রতিনিধিদল চীন সফরে যায়। চীন থেকে অতিরিক্ত অঙ্গীকার বা সাহায্য পাওয়ার আশায়। কিন্তু চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেঙ ফী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। বাঙালি বিরোধী বক্তব্য না রাখলেও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে চীন নিয়মিতভাবে পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র পাঠাতো। এছাড়াও গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দানের জন্য চীন অক্টোবর মাসে ঢাকায় ২০০ (দু'শ জন) সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর হতে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান মোট ২০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চীনা সামরিক উপরকণ সাহায্য হিসাবে পেয়েছে- যার মধ্যে ১৯৭১ সালেই সরবরাহ করেছিল ৪৫ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র। আর চীনের রাইফেল ও অন্যান্য উন্নত সমরাস্ত্র দিয়েই পাকবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করেছে বাঙালিকে।

**খ. ৩ ডিসেম্বর হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১:** ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পূর্বাঞ্চলে সামরিক হামলা করলে শুরু হয় সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ। এ সময় হতে চীন জাতিসংঘে সরাসরি বাঙালি বিরোধী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। পাক–ভারত যুদ্ধের জন্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করে। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং পাকবাহিনীর বর্বরতার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করার লক্ষে ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে দু'টি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু প্রস্তাব দুটোর বিরুদ্ধে চীন প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে এবং চীনের নিজস্ব প্রস্তাবে ভারতকে আগ্রাসী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, চীন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের মাত্র ৪০ দিনের মাথায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী আসন লাভের পর প্রথম প্রস্তাবেই ভেটো প্রয়োগ করেছিল। যাহোক, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে চীন এক বিবৃতিতে 'তথাকথিত' বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের তীব্র সমালোচনা করে। স্বাধীন বাংলাদেশকে 'তথাকথিত বাংলাদেশ' বলে অভিহিত করা বাঙালির স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি ছিল চরম ঘৃণা ও অবহেলার শামিল। এমনকি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চীন বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়নি।

**বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের বিরোধিতার কারণ:** চীনের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী নীতি গ্রহণের কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়-

১. চীন নিজেই একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। চীনা, মঙ্গোল, তিব্বতি, তুর্কি ইত্যাদি জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সত্তা। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নে চীনা জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে তখনই অনেক সমস্যা বিদ্যমান। তাই একাধিক জাতি অধ্যুষিত পার্শ্ববর্তী কোন দেশে সংগ্রামরত কোন জনগোষ্ঠীকে সমর্থন করলে ভবিষ্যতে তা তার অভ্যন্তরীণ সংহতির প্রতি হুমকি হবার সম্ভাবনা ছিল।

২. চীন নিজেই তাইওয়ানকে মূল ভূ-খন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট ছিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে স্বাধীন হওয়ার সংগ্রামে সমর্থন দিলে তা হতো চীনের দ্বিমুখী নীতিরই পরিচায়ক।

৩. চীনের বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ স্বত:স্ফূর্ত সংগ্রাম ছিল না এবং সত্যিকার অর্থে এটা কৃষক-শ্রমিক জনতার সমর্থনপুষ্ট একটি গণযুদ্ধ ছিল না। বরং ভারত- পাকিস্তান সমর্থনপুষ্ট হয়ে কিছু বিভ্রান্ত বুর্জোয়া বাঙালি নেতা পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের সংগ্রামে লিপ্ত বলে চীন মনে করেছিল।

৪. ভারতে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য কর্মকান্ড থেকে চীন যথার্থই অনুধাবন করেছিল যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তা হবে ভারতের প্রভাবাধীন একটি রাষ্ট্র এবং চূড়ান্ত বিচারে চীনের দক্ষিণ সীমান্ত এলাকায় এ রাষ্ট্রটি রুশ-ভারত আঁতাতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে- যা হবে চীনের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ।

৫. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক ছিল শত্রুতার। তাই দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নর প্রভাব সম্প্রসারণ মোকাবেলায় পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সহযোগিতা করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর চীন শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান দূর্বল হয়ে পড়লে ভারতের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

৬. পাকিস্তান ছিল চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাই সংকটকালে চীন যদি পাকিস্তানকে সমর্থন না করে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে, তবে অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে চীনের বন্ধুত্ব নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হবে।

সুতরাং নিজস্ব সুবিধা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সব কিছু বিবেচনা করেই চীন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তবে চীনের দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে চীন কর্তৃক শক্তিশালী পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার নীতি গ্রহণযোগ্য হলেও আদর্শিক দিক দিয়ে বিচার করলে চীনের নীতি ছিল বিভ্রান্তকর। কারণ আওয়ামী লীগ একটি বুর্জোয়া দল হলেও মুক্তিযুদ্ধ কোন দলের ছিল না বরং কৃষক-শ্রমিক-জনতার অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ একটি গণযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। আপামর জনতা ছিল এ যুদ্ধের প্রধান শক্তি। সুতরাং বলা যায় যে, আদর্শ নয় বরং জাতীয় স্বার্থেই চীন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী।

## সারসংক্ষেপ

*মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে চীনের যে ভূমিকা ছিল তা আপাতদৃষ্টিতে পাকিস্তান ঘেষা হলেও মূলত তা ছিল চীনের জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিত করার নীতি। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বিরুদ্ধে রুশ-ভারত আঁতাতের ফলে চীন বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সে প্রতিবেশী অপর রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের বিরোধিতার জন্য বাংলাদেশের চীনপন্থী দলগুলোর ভূমিকাকেও ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ চীনপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনকে বুর্জোয়া পথ বলে তা গ্রহণ করেনি এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত যে কোন পদক্ষেপের মধ্যে ভারতের গন্ধ খুঁজতে ব্যস্ত থাকতো। সুতরাং এদেশের বামদের কর্মকান্ডও চীনা নীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। তবে সরকারিভাবে চীনা নীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে হলেও চীনের অধিকাংশ জনগণের সমর্থন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি। তাই ১৯৭১ সালের ৭ নভেম্বর ভুট্টোর চীন সফরকালে পিকিং-এ একদল চীনা যুবক ভুট্টো ও পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগান দিয়ে জানতে চায় যে, পাকিস্তান সরকার কেন পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, চীন জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রথমবারই ভেটো ক্ষমতা*

*প্রয়োগ করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও চীন বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' বাংলাদেশ বলে আখ্যায়িত করে।*

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

১। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা।*

২। মেজর রফিকুল ইসলাম পি.এস.সি, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: বিরোধী শক্তি ও বৃহৎশক্তির প্রতিক্রিয়া।*

৩। এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান।*

৪। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খন্ড।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দানের জন্য চীন অক্টোবর মাসে ঢাকায় কতজন সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল?
(ক) ১০০ জন (খ) ২০০ জন
(গ) ৫০০ জন (ঘ) ১০০০ জন।

২। ১৯৭১ সালে চীন পাকিস্তানকে কি পরিমাণ মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করেছিল?
(ক) ৪৫ মিলিয়ন ডলার (খ) ৪৫০ মিলিয়ন ডলার
(গ) ১০০ মিলিয়ন ডলার (ঘ) ৫০০ মিলিয়ন ডলার।

৩। নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভ (ভেটো ক্ষমতা লাভ) করার পর চীন কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল?
(ক) ভারত (খ) সোভিয়েত ইউনিয়ন
(গ) বাংলাদেশ (ঘ) পাকিস্তান।

৪। চীন কোন দেশকে নিজস্ব ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট ছিল?
(ক) তাইওয়ান (খ) মঙ্গোলিয়া
(গ) ভারত (ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৫। বাংলাদেশের সংকট নিয়ে চীনের প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় কত তারিখে?
(ক) ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ (খ) ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ
(গ) ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরু হতে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরর পূর্ব পর্যন্ত চীনা নীতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করুন।

২। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর পর হতে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি চীনা নীতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের বিরোধিতার দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।

**রচনামূলক প্রশ্ন:**

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের নীতি ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন কেন বিরোধিতা করেছিল? আলোচনা করুন।

*পাঠ-৫*

# *মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ কোন ধরনের মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে তা জানতে পারবেন;*
- *যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে জাতিসংঘ কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানতে পারবেন;*
- *শেখমুজিবুর রহমানের বিচার ও মুক্তিদান বিষয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান বিষয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা কি ছিল তা জানতে পারবেন।*

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। কারণ একটি আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা ক্রমশ মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত হয় এবং এক পর্যায়ে আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে তা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাক শাসকদের শোষণ, বঞ্চনা, হত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার (প্রায় ৫৬ ভাগ) স্বাধীনতার সংগ্রাম। সুতরাং যে সংগ্রামের প্রতি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সমর্থন সে সংগ্রামের প্রতি জাতিসংঘের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জাতিসংঘ এমন একটি বিশ্ব সংস্থা যেখানে প্রধানত বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ ইস্যুতে বৃহৎ শক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গী কি বা ঐ ইস্যুকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেছে মূলত তার ওপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐকমত্য ব্যতীত জাতিসংঘ কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

## জাতিসংঘের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বা কার্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তৎপরতা;

খ. যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ;

গ. মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘ;

ঘ. শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্ন ও জাতিসংঘ;

ঙ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রশ্ন ও জাতিসংঘ।

## ক. মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তৎপরতা:

মানবিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ভূমিকায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব হতেই শরণার্থী সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে এবং দ্রুত এটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংকট হতে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী আর কখনো বাস্তুচ্যুত হয়নি। জাতিগত নিপীড়ন, হিন্দু বিদ্বেষ ও গণহত্যার কারণে বিশেষ করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে যে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হয় তারপর হতে প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার সন্ধানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। ডিসেম্বর নাগাদ শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি। এই বিপুল পরিমাণ শরণার্থীর খাদ্য, পানীয়, ঔষধপত্র, মাথাগোঁজার ঠাঁই ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে। আর এই জটিল অবস্থা মোকাবেলায় অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক বিষয়ে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের ভাষায়; The organization (UN) mounted largest humanitarian operation in its history during and after in conflict over Bangladesh.

১৯৭১ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) প্রধান প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান শরণার্থী সমস্যাকে জাতিসংঘের জন্য এক মানবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেন। যাহোক, মানবিক সমস্যা মোকাবেলায় উপমহাদেশে জাতিসংঘের দুটো মিশন কাজ করে। এর একটি পরিচালিত হয় ভারতে, অপরটি দখলীকৃত বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে)।

শরণার্থী সমস্যায় মানবিক সাহায্য প্রদানে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ সরাসরি প্রস্তাব প্রদান করে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল। কিন্তু জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী সরাসরি এর বিরোধিতা করেন। তবে পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্ট ২২ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মত মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পত্র দেন। এ পত্রে মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইয়াহিয়াকে তিনি জানান যে, ২৫ মার্চের 'ক্র্যাকডাউন'এর পর ঢাকা থেকে জাতিসংঘের যে সকল কর্মকর্তা ফেরৎ এসেছেন তাদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এছাড়াও জাতিসংঘের কাঠামোতে মানবাধিকারের যে নীতিমালা রয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ইয়াহিয়াকে তিনি জানান যে, পাকিস্তানের সম্মতি পেলে জাতিসংঘ এবং তার বিশেষায়িত সংস্থাগুলো একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে দূর্গতি ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার সহায়তায় জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে পারে।

**সরেজমিনে শরণার্থী পর্যবেক্ষণ:** সরেজমিনে শরণার্থী পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) প্রধান সদরুদ্দিন আগা খান জুন মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন। ১২ জুন তিনি চুয়াডাঙ্গা ও বেনাপোলে পাকিস্তান সরকার স্থাপিত দুটো ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। অবশ্য এসব ক্যাম্প ছিল মূলত সাজানো ও প্রতারণামূলক কৌশলের অংশ। পাকিস্তান সফর শেষে ১৫ জুন তিনি কলকাতা পৌঁছেন এবং ভারত সফর শেষে ২৩ জুন জেনেভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক সমাধানই শরণার্থীদের মনে প্রকৃত আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাতে পারে। সদরুদ্দিন আগা খানই জাতিসংঘের প্রথম উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি সরেজমিনে ঘটনাবলী

পর্যালোচনা করে এই স্বীকারোক্তি করেন। তথাপি জাতিসংঘ পরবর্তী মাসগুলোতে গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানের উদ্যোগ নেয়নি। তবে ভারত ও পাকিস্তানে জাতিসংঘের এজেন্সীসমূহের ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয় করার জন্য সংস্থাটি ইতিহাসে প্রথমবারের মত জেনেভায় একটি নির্বাহী সংস্থা (Standing Committee) গঠন করে।

**অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের তৎপরতা:** জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ'-এর সদর দফতর জেনেভায় পরিষদের ৫১তম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৭১ সালের ৫ জুলাই। উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব ভারত ও পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিতে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাকে আহবান জানান। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রধান সদরুদ্দিন আগা খান রিপোর্ট করেন যে, ভারতে শরণার্থীদের জন্য আরও ব্যাপক সাহায্য প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, সংকট মোকাবেলায় সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ৪০ কোটি ডলার প্রয়োজন এবং এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মঞ্জুরী, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার অনুদান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ৯ কোটি ৯৪ ডলার পাওয়া গেছে। তিনি শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেরার টিকা ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরের বিবরণ দেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ১১ দিনব্যাপী বিতর্ক ও আলোচনার পর ১৬ জুলাই উপমহাদেশে জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমকে অনুমোদন করা হয়। এ অনুমোদনের মাধ্যমে দুটো স্বতন্ত্র ত্রাণ কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দেয়া হয়-

১. ভারত আশ্রিত বাঙালি শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম- যা ছিল জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ত্রাণ কার্যক্রম। এর তত্ত্বাবধানে ছিল জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা।

২. পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রম। এটি পরিচালিত হয় জাতিসংঘের একজন আবাসিক প্রতিনিধির নেতৃত্বে। এটি ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র কার্যক্রম।

**১. ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম:** ভারতে আশ্রিত বিপুল পরিমাণ শরণার্থীদের সাহায্যে প্রথম ভারত সরকারই এগিয়ে আসে এবং পরবর্তীকালে দ্রুত বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপন করে। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন নির্লিপ্ত জাতিসংঘের সমালোচনা করে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় উল্লেখ করেন যে, মানবিক দূর্গতির এ মুহূর্তে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতাকে দূর্গত জনগণ উদাসীনতা মনে করে। ১৮ মে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বৃহৎ শক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, শরণার্থীদের দায়দায়িত্ব বহন করতে বৃহৎ শক্তিবর্গের এগিয়ে আসা উচিত। ভারত যুক্তি দেখায় যে, পাকিস্তান তার বেসামরিক নাগরিকদের ভারতে ঠেলে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। ভারতের এ ধরনের প্রচারণায় জাতিসংঘ সহ বৃহৎ শক্তির অনেকেই শরণার্থী সমস্যায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।

**শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে জাতিসংঘের আহ্বান:** ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের সাহায্য দানের জন্য ১৯ মে জাতিসংঘ মহাসচিব বিভিন্ন দেশের সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও জনগণের নিকট আবেদন জানান। অবশ্য এর পূর্বে ২৩ এপ্রিল জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন মহাসচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বপ্রথম ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের

সহায়তা কামনা করেন এবং ১২ মে তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীদের একটি তালিকা জাতিসংঘে প্রদান করেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তিনি জাতিসংঘ মহাসচিব ও বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থাগুলোকে সাহায্য প্রদানের আবেদন জানান। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ মহাসচিবের আবেদনের পর পূর্ব পাকিস্তান সংকট দ্রুত আন্তর্জাতিক রূপ নেয়।

১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত জাতিসংঘ ভারতকে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ৯,৮০,০০,০০০ মার্কিন ডলার (৯৮ মিলিয়ন ডলার) অর্থ প্রদান করে। পরবর্তী মাসগুলোতে জাতিসংঘ আরও বেশ কিছু সাহায্য ও সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করে। তবে সর্বসাকূল্যে সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২১৫ মিলিয়ন ডলার। প্রয়োজনের তুলনায় এটা ছিল খুবই নগন্য।

৪ অক্টোবর জেনেভায় জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার নির্বাহী কমিটির বৈঠকে সংস্থার প্রধান সদরুদ্দিন আগা খান উল্লেখ করেন যে, শুধু ভারতে শরণার্থী শিবিরে ত্রাণ চালিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এমনকি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটির বৈঠকে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানে জাতিসংঘ সাহায্য হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে আকাশ পথে অন্যতম বৃহৎ মানবিক সাহায্য। এই বৈঠকে তিনি প্রতিদিনের ব্যয় ও এককালীন ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন এবং শরণার্থী সংস্থার বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ দেন। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে শরণার্থী সংস্থার আবাসিক প্রতিনিধির নেতৃত্বে ইউনিসেফ, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় অগণিত শরণার্থী শিবিরে কাজ করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, শরণার্থী সাহায্যের জন্য ভারত এপ্রিলে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ, ২৬ জুন ৪০০ কোটি ডলার, এবং ২৬ অক্টোবর ৭০৯ কোটি ডলার দাবি করে। যাহোক, শরণার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণেই যে ভারতের দাবি ক্রমশ বেড়েছে, সদরুদ্দিনের প্রতিবেদন তারই প্রমাণ বহন করে। অবশ্য উপমহাদেশে শান্তি ফিরিয়ে এনে লাখ লাখ শরণার্থীর প্রাণ বাঁচানো যায় বলেও সদরুদ্দিন আগা খান পুনরায় উল্লেখ করেন। যাহোক তৃতীয় কমিটিতে উপস্থাপিত সদরুদ্দিন আগা খানের বিবরণ হতে তৎকালীন সময় পর্যন্ত ভারতে জাতিসংঘের পণ্য সাহায্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়:

| | সাহায্যের বিষয় | সাহায্যের পরিমান |
|---|---|---|
| ১. | খাদ্য সাহায্য | ৬২৬৭ টন |
| ২. | যানবাহন | ২২০০টি |
| ৩. | ঔষধ সামগ্রী | ৭০০ টন |
| ৪. | আশ্রয় তৈরীর জন্য পলিথিন | ৩০ লক্ষ শরণার্থীর জন্য যা প্রয়োজন |

ভারতে শরণার্থীদের ব্যাপক চাপকে ভারত তার ওপর পাকিস্তানের সিভিল আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করে। এই শরণার্থীরা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তা সেখানে কর্মরত জাতিসংঘের কর্মকর্তারাও স্বীকার করেন। কিন্তু শরণার্থীদের জন্য ভারত কিছু আন্তর্জাতিক সাহায্য পেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। তাই ভারতকে তার নিজস্ব তহবিল থেকে শরণার্থীদের জন্য অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ করতে হয়েছে।

জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গ সংস্থাগুলো শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক মানবিক সমস্যাগুলো সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই মানবিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তবে

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ও অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থার এখতিয়ারের মধ্যে তা ছিল না। অন্যদিকে ভারত চেয়েছিল যে, শরণার্থী সমস্যা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হলে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শরণার্থী সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে ভারত বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার আইনগত যুক্তি খুঁজে পাবে। জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যর্থতায় ভারত যথারীতি তা করতে পেরেছিল।

**২. পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণকার্য পরিচালনা:** পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের সাহায্য প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রথম দিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ ধরনের উদ্যোগকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু ১৭ মে ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা মোজাফফর আহমেদ জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বহির্বিশ্বের কূটনৈতিক চাপ এবং ১৯৭০-এর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ, ক্ষেতের ফসল রেখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া, ভয়হীন চিত্তে ফসল উৎপাদন করতে না পারা ইত্যাদি কারণে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির মুখে ইয়াহিয়ার নীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। ফলে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। এ অবস্থায় জাতিসংঘ মহাসচিব পাকিস্তানের অনুরোধে ১৬ জুন দ্বিতীয়বার বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন- পাকিস্তান সরকার ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ মনে করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সামগ্রীর জরুরি প্রয়োজন এবং ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য পরিবহন দরকার। ফলে জাতিসংঘের উদ্যোগে পূর্ব পকিস্তানে পরিচালিত হয় UNEPRO (United Nations East Pakistan Relief Operation) কার্যক্রম।

UNEPRO-তে কাজ করার জন্য একটি রিলিফ টিম গঠনের বিষয়টি জাতিসংঘ সদর দফতর থেকে ঘোষণা করা হয় ২ আগস্ট। এ দলটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, এদের কাজ হবে সম্পূর্ণ ত্রাণ তৎপরতা বিষয়ক। তবে পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধি জন আর. কেলি ইতোপূর্বেই অর্থাৎ ২৮ জুলাই ঢাকায় আগমন করেছিলেন। আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত মহাসচিব স্বয়ং এবং এরপর সহকারী মহাসচিবের মর্যাদাপ্রাপ্ত ফরাসি কূটনৈতিক পল মার্ক হেনরি পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন।

**জাতিসংঘ ত্রাণ বিতরণে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা:** সদর দপ্তরের পরিকল্পনা ও সহায়তা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাহায্য ক্ষুধার্ত মানুষ ও ভূক্তভোগীদের হাতে খুব কমই পৌঁছে। কারণ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা ত্রাণ বিতরণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন, যথা-

১. জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার যানবাহন পাকিস্তানিরা বিভিন্ন সময় নিজেদের সামরিক কাজে ব্যবহার করে। এমনকি জাতিসংঘের ত্রাণ সামগ্রীও বিভিন্ন সময় ছিনিয়ে নেয়। পাক সেনাবাহিনী ছাড়াও তাদের বাঙালি সহযোগী যেমন, 'শান্তি কমিটি' ও 'রাজাকার' বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাৎ এমনকি কোন কোন স্থানে তারা জাতিসংঘের ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করে বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

২. জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও ত্রাণ কর্মীগণ স্থানীয় ভাষা জানতেন না। ফলে তাদেরকে ত্রাণ বিতরণে পাক সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

৩. প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে একটা ভীতি সর্বদাই তাদের মধ্যে কাজ করত এবং মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ছিল অনেক।

৪. জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতাকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে, ইত্যাদি।

জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে এ ধরনের প্রহসন ও দূর্গতি সত্ত্বেও জাতিসংঘ কর্মকর্তারা কয়েকটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন ছাড়া তেমন কিছু করেন নি। অবশ্য এর সাথে তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। তবে জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ তৎপর হয়ে ওঠে এবং একটি শক্তিশালী অবস্থান নেয়। নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ পাকিস্তান সরকারের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সেখানে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। চুক্তি অনুযায়ী ত্রাণকর্মীরা অবাধে পূর্ববাংলায় প্রবেশ ও চলাচলের অধিকার অর্জন করে। এমনকি ত্রাণ তৎপরতাকে সম্পূর্ণ মানবিক বলেও চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে বেসরকারিভাবে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করেছিল তাদের অন্যতম একটি কর্মসূচি হচ্ছে 'ইউনিসেফ-কেয়ার শিশু খাদ্য কর্মসূচি'। এ কর্মসূচির উদ্যোক্তাগণ পাক শাসকদের সাথে লিখিতভাবে চুক্তি করেন যে, স্কুলে উপস্থিতির পাশাপাশি অনুপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীদেরকেও সাহায্য দেয়া হবে। এর ফলে যেসব ছাত্র/ছাত্রীরা ভয়ে বা অন্য কারণে স্কুলে যেত না তারাও সাহায্য পায় এবং কর্মসূচিটি সফল হয়।

কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্ট ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে ঝুঁকিপূর্ণ কারণে সাহায্য সামগ্রী পরিবহন অসম্ভব হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ তৎপরতা স্থগিত ঘোষণা করেন। অবশ্য ভারতে ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

## খ. যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ

শরণার্থী সমস্যা ক্রমশ একটি আন্তর্জাতিক সংকটের পটভূমি সৃষ্টি করে। ফলে ভরণ-পোষণের মতো মানবিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। তবে বাংলাদেশ সংকটকে বৃহৎ শক্তিগুলো স্বীয় জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্য প্রকাশ্য এবং গোপন কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সমান্তরালে জাতিসংঘ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ ও কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সদস্য দেশসমূহের প্রতিক্রিয়া।

**১. জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব:** জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯৭১ সালের ১৯ জুলাই জাতিসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিদ্বয়ের কাছে প্রস্তাব করেন যে, সীমান্তের দুই প্রান্তে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকি করার জন্য UNHCR-এর প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকার আনন্দের সাথে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু ভারত ও মুজিবনগর সরকার প্রস্তাবটি দৃঢ়ভাবে বাতিল করে দেয়। উল্লেখ্য প্রথমদিকে ভারত চেয়েছিল যে, পূর্ববাংলায় গণহত্যা বন্ধ ও সেখান থেকে আসা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করুক। অন্যদিকে প্রথমে পাকিস্তান শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘের জড়িত হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে চায়নি এবং এ ধরনের যে কোন উদ্যোগকে পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল বলে বিবেচনা করে। কিন্তু মে মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে ইয়াহিয়া খান জাতিসংঘের যাবতীয় উদ্যোগ মেনে নিতে সম্মত হয় ও কূটনৈতিক তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে যাতে জাতিসংঘের চাপে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এবং জাতিসংঘের

মধ্যস্থতায় তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়। কিন্তু ভারত বিষয়টি অনুধাবন করে জাতিসংঘের মানবিক উদ্যোগের ছদ্মাবরণে রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। কারণ জাতিসংঘ মহাসচিব গণহত্যা বন্ধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে একেবারেই নীরব ছিল। স্পষ্টতই পর্যবেক্ষক মোতায়েনের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, বাংলাদেশের চার পাশ ঘিরে রেখে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধাভিযান প্রতিরোধ করা এবং দ্বিতীয়ত, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সহায়তার পথ বন্ধ করা। যাহোক, মুজিবনগর সরকার ও ভারতের প্রত্যাখ্যানের পর জাতিসংঘ কর্মকর্তারা শরণার্থী সংস্থার পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবটি বাতিল করে দেয়।

**২. নিরাপত্তা পরিষদ বরাবর জাতিসংঘ মহাসচিবের স্মারকপত্র প্রদান:** পাক-ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাবের একদিন পর ২০ জুলাই ১৯৭১ জাতিসংঘ মহাসচিব ৯৯ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। মহাসচিবের এই স্মারকপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মূল ইস্যুগুলো এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর এ উদ্যোগের লক্ষ ছিল পাকিস্তানকে কিছুটা সহায়তা করা। কারণ বাংলাদেশ সংকটকে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের পূর্ববর্তী শত্রুতার জের হিসেবে উল্লেখ করেছেন– যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয় এবং ভারত ও পাকিস্তানকে তিনি বিবদমান পক্ষ হিসেবে দেখিয়েছেন, কিন্তু বাংলাদেশ যে একটি পক্ষ তা তিনি উল্লেখ করেননি। তাছাড়া ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বনাম রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হয়েছিল তার উল্লেখ করে বাংলাদেশ সংকটকেও তিনি আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন এমনকি পাকবাহিনী কর্তৃক বাঙালির গণহত্যার বিষয়টি তিনি উল্লেখই করেন নি।

**৩. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ:** ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন। জাতিসংঘের এ অধিবেশনে এজেন্ডাভুক্ত বিষয় হিসেবে 'বাংলাদেশ সংকট' সরাসরি স্থান পায়নি। তবে মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে। মহাসচিব কর্তৃক বাংলাদেশ শব্দটির উল্লেখ না করা এবং স্বয়ং সাধারণ পরিষদের সভাপতির বাংলাদেশ সংকটকে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও ৫৭টি দেশ তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে। এর মধ্যে ২৪টি দেশ সমস্যার মানবিক দিক এবং ৩৩টি দেশ মানবিক বিষয়ের সাথে সমস্যার রাজনৈতিক দিকটি চিহ্নিত করে। অধিবেশনের সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আদম মালিক বাংলাদেশ প্রশ্নে সাধারণ পরিষদে বিতর্কের পক্ষে ছিলেন না। তিনি সমস্যাটিকে মূলত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেকার দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে উভয় দেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের কথা উল্লেখ করেন। অবশ্য অধিবেশন শুরুর দু'দিন আগে জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্ট তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, যদিও 'গৃহযুদ্ধের' বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় তবে এ বিষয় থেকে যে সকল সমস্যার জন্ম হয়েছে তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই উদ্বেগের কারণ এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের অগ্রগতি খুবই কম। যাহোক, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ সংকট আলোচিত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যে শতাধিক সদস্য রাষ্ট্র অধিবেশনে যোগদান করে তারা বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়।

**৪. জাতিসংঘ মহাসচিবের Good Office প্রস্তাব:** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন একটি চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সে সময় জাতিসংঘ মহাসচিব সংকট নিরসনে আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০ অক্টোবর ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে এক পত্রে তিনি তাঁর Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। মহাসচিবের এই পত্রটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো সমগ্র বিষয়টিকে তিনি ভারত- পাকিস্তান সংঘাত হিসেবে

বিবেচনা করেন। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও সমস্যাটিকে পাক-ভারত সংঘর্ষে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ইয়াহিয়া ও জাতিসংঘ মহাসচিব দু'জনই সমস্যাটিকে দেখেছেন পাক-ভারত সমস্যা হিসেবে। কারণ তাহলে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই মহাসচিবের প্রস্তাবের একদিন পরই পাকিস্তান প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানায়। কিন্তু ভারত কিছুটা সময় নিয়ে ১৬ নভেম্বর কৌশলে মহাসচিবকে জানায় যে, ভারত-পাকিস্তানের পরিবর্তে তাঁর উচিত ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান করা। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বার্তায় মহাসচিবের বিরুদ্ধে মূল সমস্যা পাশ কাটিয়ে কৌশলে পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে রক্ষা করতে চাওয়ায় একটি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ উচ্চারিত হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব এতে বিব্রতবোধ করেন এবং ২২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত বার্তায় অভিযোগ অস্বীকার করেন।

উপমহাদেশে ভূমিকা পালনের জন্য জাতিসংঘের আরও একটি উদ্যোগের এভাবেই সমাপ্তি ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি হতে জাতিসংঘ মহাসচিব দু'সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগ, Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব ইত্যাদি যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা আপাতদৃষ্টিতে সাধু উদ্যোগ মনে হলেও এসব ছিল যুক্তরাষ্ট্র বিশেষত নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির চিন্তাধারার পরিপূরক। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলো সে সময় এ ধরনের উদ্যোগ আশা করত।

## গ. মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘঃ

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যেসরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে তা আরও বিস্তৃত হয়। ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ ছিল মুজিবনগরের অসহায় মানুষ। অর্থাৎ মুজিবনগরের অসহায় মানুষের সাথে এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটির একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি দলের সাথে জাতিসংঘের সরাসরি পত্র যোগাযোগ হয় আগস্ট মাসে। পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচারে উদ্যোগী হলে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের অফিসের ডিরেক্টর ব্রায়ান ই. উরকুহার্ট বরাবর ১৮ আগস্ট প্রেরিত এক পত্রে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে জনাব মওদুদ আহমেদ ঐ মামলায় শেখ মুজিবের আইনজীবী হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। জবাবে ২৭ আগস্ট ব্রায়ান জানান যে, আইনগত জটিলতার কারণে মওদুদকে মুজিবের আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করতে মহাসচিব তার Good Office ব্যবহার করতে পারছেন না।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে মুজিবের বিচার শুরু হলে মওদুদ আহমেদ ব্রায়ানের বরাবর একটি চিঠি লিখে জানান যে, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী মহাসচিবের পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু মহাসচিব যদি তাঁর Good Office ব্যবহার করে শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করেন, তাহলে মুজিব নিশ্চয়ই তাঁর আইনজীবী হিসেবে মওদুদকেই পেতে চাইবেন। তবে এ যোগাযোগ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘ ভবনে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের পক্ষে জোরালো প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। ৪ ডিসেম্বর যুদ্ধ বন্ধ ও বিশ্বশান্তি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক শুরু হলে প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট একটি পত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরেন এবং মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখার আবেদন জানান। তবে বাংলাদেশ যেহেতু তখন স্বাধীন দেশ

কিংবা জাতিসংঘের সদস্য ছিল না তাই বাংলাদেশ প্রেরিত প্রতিনিধি দল কোন সরকারি প্রতিনিধি দল ছিল না। এজন্য জাতিসংঘ ভবনে তাদের প্রবেশ করা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে তারা জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ড. যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহায়তায় জাতিসংঘ ভবনে প্রবেশ করতেন। প্রবেশ পত্রে শুধু তারিখ থাকত। কোন জায়গা বা সময়ের উল্লেখ না থাকায় ইচ্ছামত যে কোন স্থানে ঢুকে তারা তদ্বির করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, ড. ব্যানার্জীর সহায়তায় জাতিসংঘ প্রেস উইং-এ অবস্থিত টেলিগ্রাফ অফিস হতে সহজ ও সুলভ মূল্যে জনাব চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের নিকট ঘন ঘন তারবার্তা পাঠিয়ে সাবলিল সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা আবু সাঈদ চৌধুরীকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দান প্রশ্নে ব্যাপক বিতর্কের পর তাঁকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়া না হলেও তাঁর বক্তব্য সম্বলিত পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ ও বিলি করা হয়। অর্থাৎ এটি ছিল এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকৃতি।এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি উচ্চারিত হয়। এ বিবেচনায় মুজিবনগর সরকারের জন্য জাতিসংঘ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট।

## ঘ. শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্ন ও জাতিসংঘ:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ অবস্থায় ১০ আগস্ট জাতিসংঘ মহাসচিব শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে পাক সামরিক সরকারের উদ্যোগে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে উদ্বেগের সাথে উল্লেখ করেন যে, শেখ মুজিবের বিচারের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তিনি বিষয়টিকে শুধু পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার এখতিয়ারাধীন বিষয় হিসেবে না ভেবে বরং এর রাজনৈতিক গুরুত্ব সহ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। International Commission of Jurist আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট প্রেরিত এক টেলিগ্রামে গোপন বিচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ২৭ আগস্ট মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মওদুদ আহমদের নিকট এক পত্রে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবের অফিস-এর ডিরেক্টর ব্রায়ান জানান যে, জাতিসংঘ মহাসচিব তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন এবং পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে সে চেষ্টা করছেন। শেখ মুজিবের 'প্রহসনমূলক' বিচার বন্ধে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার মুখে শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা পায়। তবে উল্লেখ্য যে, এতদিন যাবৎ জাতিসংঘ মহাসচিবের ভূমিকায় পাকিস্তান সন্তুষ্ট থাকলেও সমকালীন বিশ্বের যশস্বী নেতা শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে উ-থান্টের সাবধানবাণী তাদেরকে 'ক্ষিপ্ত' করে তোলে। তাই ১৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে মহাসচিবের এই বিবৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর নির্দেশ দেন। তদুপরি একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগপূর্ণ বিবৃতি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল।

## ঙ. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রশ্ন ও জাতিসংঘ:

মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাস মুজিবনগর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত ও রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি আদায়।এ জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানী হতে শুরু করে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনে পর্যন্ত মুজিবনগর সরকার তৎপর থাকে। আন্তর্জাতিক সমাজে যখন একটি নতুন রাষ্ট্রের

অভ্যুদয় ঘটে তখনই প্রশ্ন ওঠে স্বীকৃতির। তবে স্বীকৃতি কেবল একটি আইনগত বিষয় নয় বরং এর সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রবলভাবে জড়িয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক আইনের অধিকাংশ সমকালীন লেখক মনে করেন যে, চূড়ান্ত স্বীকৃতি তখনই দেয়া যায় যখন কোন রাষ্ট্র, রাষ্ট্র গঠনের সকল শর্ত পূরণ করে অর্থাৎ ভূ-খন্ড, জনবল, সরকার ও সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি থাকলে একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া যায়।

মুজিবনগর সরকার সব সময়ই হিলি, রৌমারী সহ কিছু কিছু এলাকা শাসন করে এবং বড় শহর ও ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া যুদ্ধরত বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ ভূমি মুজিবনগর সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ সরকারের ছিল একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী, ছিল বিদেশে কূটনৈতিক মিশন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি প্রচার যন্ত্র এবং একটি রাষ্ট্রীয় কোষাগার যেখান থেকে কর্মচারীদের বেতন দেয়া হতো। এছাড়াও মুজিবনগর সরকার ছিল একটি সর্বদলীয় সরকার। সুতরাং এ সরকার ছিল একটি কার্যকরী সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিসংঘ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পর ১৯৭৪ সালে আরব লীগ সর্বপ্রথম ফিলিস্তিন জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি হিসেবে পিএলও (Palestine Liberation Organisation)-কে স্বীকৃতি দেয় এবং পরবর্তীকালে জাতিসংঘও পিএলও-কে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৬ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ SWAPO-কে (South-West African Peoples Organisation) নামিবিয়ার জনগণের একমাত্র ও বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।এ ধরনের স্বীকৃতি প্রাপ্ত দেশগুলো জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পর্যবেক্ষক বা অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা লাভ করে।

SWAPO, PLO ও মুজিবনগর সরকারের প্রকৃতি এক হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে 'জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত না হওয়ায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক শুরু হলে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্য সম্বলিত একটি পত্র নিরাপত্তা পরিষদ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ ও বিলি করে যা ছিল বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান। এছাড়া ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব পাশ হয় সেখানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার আহবান জানানো হয়। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমবারের মত বাংলাদেশকে একটি পক্ষ হিসেব স্বীকৃতি দেয়।

## সারসংক্ষেপ

*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থে একটি জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবিতে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্যমান পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও আইনসঙ্গত। সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ নাগরিক এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সংগ্রাম ও স্বাধীনতার দাবিকে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি গণহত্যা ও মানবাধিকার প্রশ্নে জাতিসংঘ ছিল দৃশ্যত নীরব। তবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রশ্নে অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সমর্থিত প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার রেওয়াজ চালু করে। SWAPO ও PLO-কে যথাক্রমে নামিবিয়া ও ফিলিস্তিন জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান পরবর্তীকালে জাতিসংঘের সজাগ দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রমাণ। তবে গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে জাতিসংঘ মহাসচিব তাঁর মার্কিন নির্ভরতার জন্য নিন্দা করতে না পারলেও ভারতে আশ্রয় নেয়া বাঙালি শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ইতিবাচক ভূমিকা সব সময়ই পরিলক্ষিত হয়। শরণার্থী প্রশ্নে জাতিসংঘ তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। তবে*

*শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধানের জন্য যে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল তা সমাধানে জাতিসংঘ কখনোই তৎপর হয়নি। তবে ডিসেম্বরে যখন যুদ্ধ বন্ধ ও বিশ্বশান্তি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। তখন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতাকে বৈঠকে যোগদান করতে না দিলেও তাঁর বক্তব্য সম্বলিত পত্রকে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ ও বিলি করে। এটা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক ধরনের পরোক্ষ স্বীকৃতি। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জাতিসংঘ হচ্ছে এমন একটি বিশ্ব সংস্থা যেখানে প্রধানত বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ থাকায় জাতিসংঘ ত্রাণকার্য পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব পালনে পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি জাতিসংঘ সনদের ৯৯ ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিব তাঁর নিজ ক্ষমতাবলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যা কিছু করতে পারতেন, একমাত্র শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে ভূমিকা রাখা ব্যতীত অন্য কোন উদ্যোগই তিনি নিতে পারেন নি তিনি নিজের দুর্বলতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য।*

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

১। আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ।*

২। মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১।*

৩। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খন্ড।

৪। আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি।*

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য জাতিসংঘ ভারতকে কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করে-

(ক) ৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (খ) ৯৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

(গ) ১৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঘ) ৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২। সরেজমিনে শরণার্থী পর্যবেক্ষণের জন্য জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা প্রধান ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন কখন-

(ক) ১৯৭১ সালের এপ্রিলে (খ) ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে

(গ) ১৯৭১ সালের আগস্টে (ঘ) ১৯৭১ সালের জুনে।

৩। শেখ মুজিবের বিচার প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ মহাসচিব বিবৃতি প্রদান করেন কত তারিখে-

(ক) ১৫ আগস্ট (খ) ১০ আগস্ট

(গ) ১৪ ডিসেম্বর (ঘ) ৭ নভেম্বর।

৪। শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকি করতে ভারত- পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব করেন কে-

(ক) জাতিসংঘ মহাসচিব (খ) জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব

(গ) জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা প্রধান (ঘ) পাকিস্তান সরকার।

৫। মুজিবনগর সরকারের বক্তব্য সম্বলিত একটি পত্রকে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করে জাতিসংঘের কোন সংস্থা-

(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

(গ) নিরাপত্তা পরিষদ (ঘ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

১। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমের বিবরণ দিন।

২। পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে জাতিসংঘ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়?

৩। জাতিসংঘ মহাসচিবের Good Office ব্যবহারের প্রস্তাব আলোচনা করুন।

৪। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতির প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা কি ছিল?

৫। মুজিবনগর সরকার ও জাতিসংঘের মধ্যে যোগাযোগের বিবরণ দিন।

**রচনামূলক প্রশ্ন:**

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাক-ভারতে জাতিসংঘ পরিচালিত ত্রাণ কার্যক্রমের বিবরণ দিন।

৩। যুদ্ধ বন্ধ ও রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে জাতিসংঘের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর**

পাঠ-১: ১। (ক); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ঘ); ৫। (ক)।

পাঠ-২: ১। (ক); ২। (খ); ৩। (গ); ৪। (ঘ); ৫। (গ)।

পাঠ-৩: ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (ঘ); ৫। (ক); ৬। (গ)।

পাঠ-৪: ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (ঘ)।

পাঠ-৫: ১। (ক); ২। (ঘ); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ)।